জীবপ্রযুক্তি
(BIOTECHNOLOGY)

ইউনিট
১৩

ভূমিকা

জীববিজ্ঞানের একটি ফলিত শাখার নাম জীবপ্রযুক্তি। বাস্তব জগতে শাখাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নতুন দিগন্ত উম্মোচন করেছে। মানুষের কল্যাণে জীবপ্রযুক্তি ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Erecky) সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন। জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জীবপ্রযুক্তি শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত। এর মধ্যে টিস্যু কালচার এবং জেনেটিক উঞ্জিনিয়ারিং মানুষের জীবনে বেশি অবদান রাখছে। এ ইউনিটে জীবপ্রযুক্তি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

টিস্যু কালচার ল্যাব

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১.৫ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৩.১ : টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ
পাঠ ১৩.২ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপসমূহ
পাঠ ১৩.৩ : ইনসুলিন এবং Bt-বেগুন প্রস্তুতিতে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি

পাঠ-১৩.১ টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টিস্যু কালচার সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার এর প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার পদ্ধতি বা প্রযুক্তি বর্ণনা করতে পারবেন।
- টিস্যু কালচার এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	মাধ্যম, অণুচারা, টিস্যু কালচার, এক্সপ্লান্ট, আবাদ

টিস্যু কালচার : জীবদেহের গঠন ও কার্যকারিতার একককে কোষ বলা হয়। জীবদেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত। উৎপত্তিগতভাবে একই কাজ করে এমন ধরনের সম বা ভিন্ন আকৃতির কোষ সমষ্টিকে টিস্যু বলা হয়। এ টিস্যুকে জীবাণু মুক্ত কোন পুষ্টিযুক্ত মাধ্যমে চাষ ও বৃদ্ধি করাকে সংক্ষেপে টিস্যু আবাদ (Tissue Culture) বা কোষকলা আবাদ বলা হয়। টিস্যু কালচার উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা এবং এ শাখার সাথে অন্যান্য শাখাসমূহ যেমন- উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ উৎপাদন, বংশগতিবিদ্যা, কোষ বংশগতিবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

উদ্ভিদের যে কোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন- শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচিপাতা, পত্রবৃন্ত, পরাগধানী, ভ্রূণ, ডিম্বক ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন কোন টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক মাধ্যমে আবাদ করাকে টিস্যু কালচার বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত টিস্যু থেকে অধিক সংখ্যক নতুন চারা উদ্ভিদ উৎপাদন করাই টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

টিস্যু কালচার জীবপ্রযুক্তির একটি নতুন মাধ্যম হলেও, ইতিমধ্যে এ প্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভিদ প্রজনন, উদ্ভিদ উৎপাদন ও উদ্ভিদের মান উন্নয়নে ব্যাপক সফলতা এসেছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের টিস্যু কালচার পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানব কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে বাণিজ্যিকভাবে উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। ফলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি ইতিমধ্যে এ সমস্ত দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে।

টিস্যু কালচার এর প্রকারভেদ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় একটি কোষ, কোষকলা বা টিস্যু, একটি সম্পূর্ণ অঙ্গ বা সম্পূর্ণ এককোষী জীব কালচার করা যায় অর্থাৎ টিস্যু কালচারের অর্থ ব্যাপক। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন- (ক) কক্ষমুকুল কালচার, (খ) মেরিস্টেম কালচার, (গ) মাইক্রো প্রোপাগেশন, (ঘ) ক্যালাস কালচার এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, (ঙ) দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন, (চ) পরাগধানী কালচার এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি।

টিস্যু কালচার পদ্ধতি : টিস্যু কালচার পদ্ধতি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়। নিম্নে টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

১। এক্সপ্লান্ট নির্বাচন : টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে উদ্ভিদের যে সকল অংশ পৃথক করে ব্যবহার করা হয় তাকে এক্সপ্লান্ট বলা হয়। উন্নত গুণসম্পন্ন, সতেজ, স্বাস্থ্যবান ও রোগমুক্ত উদ্ভিদকে এক্সপ্লান্টের জন্য নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত মাতৃ উদ্ভিদ থেকে জীবাণুমুক্ত ধারালো ছুরি দিয়ে এক্সপ্লান্ট কেটে নেয়া হয়। পুষ্টি মাধ্যমে স্থানান্তরের আগে এক্সপ্লান্টকে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, মারকিউরিক ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, ব্রোমিন পানি বা ৭০% অ্যালকোহল ইত্যাদির যে কোনো একটি ব্যবহার করে পৃষ্ঠতলীয় নির্বীজন (Surface sterilization) করে নিতে হবে।

২। আবাদ মাধ্যম তৈরি : টিস্যু কালচারের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে পুষ্টিমানের উপর। টিস্যু কালচারের জন্য কোন একক পুষ্টি মাধ্যম নেই। বিভিন্ন প্রকার আবাদ মাধ্যম এর মধ্যে MS মিডিয়া (Murashige and Skoog 1962) ও বি৫ মিডিয়াম (Gamborg *et al.* 1968) সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পুষ্টি, ভিটামিন, ফাইটোহরমোন, সুক্রোজ এবং অর্ধ-কঠিন মাধ্যম (Semi Solid Medium) তৈরির জন্য জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন অ্যাগার (Agar) প্রভৃতি সঠিক মাত্রায় মিশিয়ে আবাদ মাধ্যম তৈরি করা হয়। উল্লেখ্য পুষ্টি মাধ্যমের p^H নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ৫.৫-৫.৮ এর মধ্যে রাখাই উত্তম। এসব মৌলিক পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ পুষ্টি মাধ্যমকে ব্যালান্স মিডিয়ামও বলা হয়।

৩। জীবাণুমুক্ত আবাদ প্রতিষ্ঠা : পুষ্টি মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট স্থানান্তড়রের আগে একে জীবাণুমুক্ত করতে হয়। একে নির্বীজকরণ বলা হয়। কালচার মিডিয়ামে থাকে পুষ্টি উপাদান তাই সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। কিন্তু কালচার করার জন্য মিডিয়াম এবং এক্সপ্লান্ট জীবাণুমুক্ত থাকা আবশ্যক। এজন্য আবাদ মাধ্যমকে কাচের পাত্রে (যেমন- টেস্টটিউব, কনিক্যাল ফ্লাস্ক) নিয়ে তুলা বা প্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হয়। পরবর্তীতে অটোক্লেভ যন্ত্রে ১২১° সে. তাপমাত্রায় ১৫ lb/sq. inch চাপে ২০ মিনিট রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

৪। মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট স্থাপন : জীবাণুমুক্ত তরল আবাদকে ঠান্ডা জমাট বাঁধার পর এক্সপ্লান্টগুলোকে এর মধ্যে স্থাপন করা (Inoculate) হয়। এক্সপ্লান্ট কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেষ্টটিউবে রাখা পুষ্টি মাধ্যমে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যাতে নিচের কাঁটা প্রান্তটি পুষ্টি মাধ্যম স্পর্শ করে অবস্থান করে। তারপর কাচের পাত্রের মুখ পুনরায় বন্ধ করে দিতে হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি লেমিনার এয়ার ফ্লো (Laminer Air Flow) নামক যন্ত্রের নিচে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে করা হয়।

৫। ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি : নির্দিষ্ট আলোর তীব্রতা ৩০০০-৫০০০ লাক্স, আর্দ্রতা ৭০-৭৫% ও তাপমাত্রা ১৭°-২০° সে. সম্পন্ন নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বর্ধনের জন্য রাখা হয়। এ পর্যায়ে আবাদে স্থাপিত টিস্যু বারবার বিভাজনের মাধ্যমে সরাসরি অণুচারা (Plantlets) তৈরি করে বা অবয়বহীন টিস্যু মন্ডে পরিণত হয়। এ টিস্যু মন্ডকে ক্যালাস (Callus) বলা হয়। এ টিস্যু মন্ড থেকে পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে একাধিক অণুচারা উৎপন্ন হয়।

৬। চারা উৎপাদন : মুকুলগুলোকে সাবধানে কেটে নিয়ে মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখা হয় এবং সেখানে প্রতিটি মুকুল, মূল সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ চারায় পরিণত হয়।

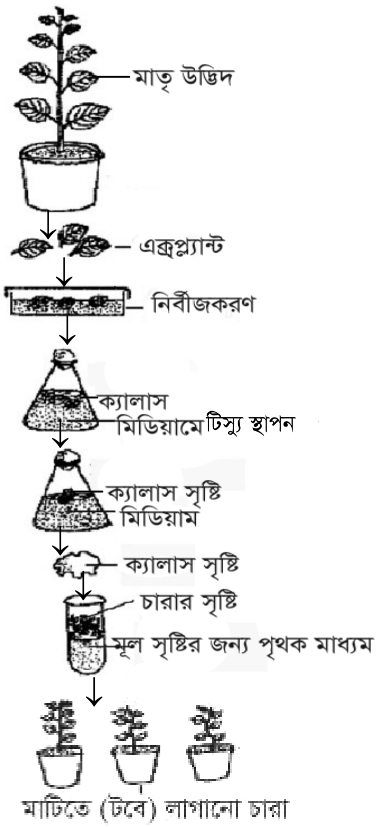

চিত্র ১৩.১ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

৭। চারা টবে স্থানান্তর : উপযুক্ত সংখ্যক সুগঠিত মূল সৃষ্টি হলে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ কালচার করা পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে ধীর প্রক্রিয়ায় সাবধানতার সাথে টবে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারাগাছ উৎপাদন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৮। প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর : টবসহ চারাগাছকে কিছুটা আর্দ্র পরিবেশে রাখা হয়। টবে লাগানো চারাগুলো কক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগুলো সজীব ও সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

উল্লেখ্য, টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বর্তমানে অনেক ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। টিস্যু কালচার এর প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যভেদে বিভিন্ন রকম হয়। কী ধরনের উদ্ভিদ থেকে কোন প্রকৃতি ও আকারের টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং কী ধরনের কালচার মিডিয়াম ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কালচারের উদ্দেশ্যের উপর। উপরে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি প্রয়োগভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

টিস্যু কালচার-এর ব্যবহার : টিস্যুকালচার প্রযুক্তির কৌশলকে কাজে লাগিয়ে আজকাল উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে এবং উন্নত জাত উদ্ভাবনে ব্যাপক সাফল্য পাওয়া গেছে। জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে কৃষিতে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে। এখন উদ্ভিদ কোষ বা টিস্যু থেকে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। টিস্যু কালচার প্রযুক্তি আবিষ্কারের পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদরা ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন। বিশেষ করে বীজ উৎপাদনে অক্ষম উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারা উৎপাদন সম্ভব। বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদ (যেমন- ফুল, ফল, শস্য, ওষুধ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ) এর চাহিদা বিশ্বব্যাপী। এমতাবস্থায় একমাত্র টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন সম্ভব। এ প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগিয়ে অর্কিড, গ□াডিওলাস, টিউলিপ ও লিলিসহ বহু ফুল ও ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ আবাদের মাধ্যমে কৃষি শিল্পে এক বিপ্লব এসেছে।

মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যুর কালচারও টিস্যু কালচার প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। উদ্ভিদের শীর্ষ মুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যু বলা হয়। মেরিস্টেম বা ভাজক টিস্যু অঞ্চলের কোষগুলো এত দ্রুত বিভাজিত হয় যে, সেটা রোগ জীবাণুমুক্ত থাকে। তাই কোন উদ্ভিদের মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে নতুন রোগমুক্ত উদ্ভিদ পাওয়া অধিকতর সহজ। পরাগধানী বা পরাগরেণু কালচার এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড (n) উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব। উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ অতি প্রয়োজনীয়। প্রচলিত সাধারণ উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতিতে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অনেক সময়ের ব্যাপার। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব হলে সেটা থেকে সহজেই প্রত্যাশিত ডিপ্লয়েড (2n) উদ্ভিদ পাওয়া যায়। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পৃথিবী থেকে অনেক মূল্যবান উদ্ভিদ চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। এ সমস্ত বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা অতীব জরুরী। এজন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তিই হচ্ছে উপযুক্ত মাধ্যম। কেননা এ পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে অধিক চারা উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভব। ভ্রূণ কালচার হলো টিস্যু কালচার প্রযুক্তির আর একটি বিশেষ দিক। ভ্রূণ কালচার প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যার অনেক সমস্যা সমাধান সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে আন্তঃপ্রজাতিক সংকরায়নের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ করে না, ফলে সংকর উদ্ভিদ পাওয়া যায় না। এসব ক্ষেত্রে সংরায়নের পর ভ্রূণ কালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হতে পারে না এবং পরবর্তীতে ভ্রূণ বিকাশের ফলে নতুন পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এভাবে উৎপন্ন সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নত জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়। অনেক উদ্ভিদ প্রজাতি যৌন জননে অক্ষম। এক্ষেত্রে উক্ত উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট সংযোগের মাধ্যমে সংকরায়ন সম্ভব হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট সংকর (Hybrid) উদ্ভিদ থেকে স্বাভাবিক উদ্ভিদ উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে।

একই টিস্যু কালচারে সৃষ্ট উদ্ভিদসমূহের মধ্যে প্রধানত ক্রোমোসোম অপেরণের জন্য জেনেটিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা দেখা যায়। একে সোমাক্লোনাল ভিন্নতা বা ভ্যারিয়েশন বলা হয়। এরূপ সোমাক্লোনাল ভারিয়েশনকে কাজে লাগিয়ে উন্নত ও কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য (যেমন- অধিক পুষ্টি মান, রোগ প্রতিরোধী) সম্পন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ			নিচের ছকে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ধাপগুলো লিখুন				

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদের যে কোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন- শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচিপাতা, পত্রবৃন্ত, পরাগধানী, ভ্রূণ, ডিম্বক ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন কোন টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত পুষ্টিবর্ধক মাধ্যমে আবাদ করাকে টিস্যু কালচার বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লিখিত টিস্যু থেকে অধিক সংখ্যক নতুন চারাউদ্ভিদ উৎপাদন করাই টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন- (ক) কক্ষমুকুল কালচার, (খ) মেরিস্টেম কালচার, (গ) মাইক্রোপ্রোপাগেশন, (ঘ) ক্যালাস কালচার এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, (ঙ) দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন, (চ) পরাগধানী কালচার এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। যেমন-

i. কক্ষমুকুল কালচার ii. মেরিস্টেম কালচার iii. মাইক্রোপ্রোপাগেশন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। টিস্যু কালচারে দরকার-

i. জীবাণুমুক্ত মিডিয়াম ii. পুষ্টিসমৃদ্ধ মিডিয়াম iii. পানিপূর্ণ মিডিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। উদ্ভিদের নিম্নলিখিত অংশগুলো টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত হয়-

i. শীর্ষমুকুল ii. কক্ষমুকুল iii. কচিপাতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বহুল ব্যবহৃত জীবপ্রযুক্তির হলো-

i. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ii. টিস্যু কালচার iii. জিন কৌশল

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.২ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির প্রধান ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজি, জিন ক্লোনিং, ট্রান্সফর্মেশন, ট্রান্সজেনিক প্লান্ট

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : বংশগতিবিদ্যা (Genetics) জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিকতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা। মাত্র ১৫০ বছর পূর্বে গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮৬৬) বংশগতির দুটি মূল সূত্র আবিষ্কার করেন। T. Boveri এবং E.S. Sutton (১৯০২) ক্রোমোসোমকে বংশগতির বাহক বলে আখ্যায়িত করেন। পরে O.T. Avery, C.M. Mcleod এবং Mary Mc Carty (১৯৪৪) প্রমাণ করেন যে, জিন কোষে ডিএনএ একমাত্র উপাদান যা জীবের জিনের সমষ্টিগত মলিক্যুলার প্রকৃতিবিশিষ্ট। J.D. Watson এবং F.H.C. Crick (১৯৫৩) ডিএনএ এর মডেল তথা আণবিক গঠন প্রস্তাব করেন। পরে G.L. Shapiro ও তাঁর সহকর্মীরা (১৯৬৯) *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়ার ল্যাক্টোজ অপেরন বা ল্যাক(lac)জিনটি পৃথক করেন। বস্তুত এর পর শুধু জিন পৃথককরণই নয়, এক প্রজাতির জিন পৃথক করে অন্য প্রজাতির ডিএনএ এর অভ্যন্তরে স্থানান্তর করা, সংমিশ্রিত জিনবাহী জীব তৈরি করা, জিন সংযোজন (Splicing), জিনের রিকম্বিনেশন (Recombination)বা পুনর্যোজন প্রভৃতি হয়ে পড়ে সমসাময়িক জেনেটিক্সের গবেষণার বিষয়বস্তু। এসব গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেনেটিক্সের এক নতুন শাখা, যার নাম বংশগতি প্রকৌশল বা জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering)। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, জেনেটিক্সের যে শাখায় জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন, সংশ্লেষণ ও পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করা হয় তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে DNA এর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে এবং প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর সম্ভব হয়েছে। মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তরিত করে ঐ ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি : অধিকাংশ জীবের জেনেটিক উপাদান হলো DNA। বিভিন্ন ধরনের এনজাইম, প্রোটিন এবং RNA অণুর সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকরী তথ্য DNA অণুতেই সন্নিবেশিত থাকে। মানব কল্যাণে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোন জীবের DNA এর পরিবর্তন করে নতুন প্রকৃতির DNA সমন্বয় করার কৌশল ইতিমধ্যে সফলতার সাথে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির দ্বারা জীবের বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা সম্ভব। যে টেকনোলজির মাধ্যমে কোন জীবের DNA তে প্রত্যাশিত গাঠনিক পরিবর্তন আনা যায় (রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে) সে টেকনোলজি বা পদ্ধতিকে **রিকম্বিনেন্ট DNA** টেকনোলজি বলে। একই জিনের (DNA অণু) অসংখ্য কপি তৈরি হওয়াকে **জিন ক্লোনিং** বলা হয়। জিন ক্লোনিং রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির সাহায্যে ঘটানো হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ কণা নিক্ষেপণ (Particle Bomberdment), জিন বন্দুক (Gene Gun),

ইলেক্ট্রোপোরেশন (Electroporation), ট্রান্সফর্মেশন (Transformation), ট্রান্সফেকশন (Transfection), লাইপোসোম (Lyposome) প্রভৃতির মাধ্যমে জিন বা DNA খন্ড স্থানান্তর করা হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির মূলনীতি হলো একটি জীব থেকে প্রত্যাশিত একটি নির্দিষ্ট জিন সমন্বিত DNA খন্ড বাহক দ্বারা স্থানান্তর করে গ্রাহক বা রেসিপিয়েন্ট কোষে প্রবেশ করানো এবং তথায় উক্ত জিনের বিকাশ ঘটানো। খন্ডিত DNA অংশকে গ্রাহক কোষে প্রবেশ করানোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফর্মেশন বলা হয়। ট্রান্সফর্মেশনের ফলে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এ জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) বা GE (Genetically Engineered) বা ট্রান্সজেনিক (Transgenic) জীব।

রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি প্রয়োগে *Escherichia coli (E. coli)* ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এ ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি অতিরিক্ত বৃত্তাকার ক্ষুদ্র DNA অণু আলাদাভাবে থাকে। এ অতিরিক্ত DNA অণুকে **প্লাজমিড** (Plasmid) বলে। প্লাজমিড ডিএনএ **মূল ডিএনএ ছাড়া** স্বাধীনভাবে অনুলিপিতি হতে পারে। ইহাকে *E. coli* কোষ থেকে বের করা হয় এবং কোষের মধ্যে প্রবেশ করানোও যায়। এ প্লাজমিড এর মাধ্যমে নতুন জিনের সংযোজন এবং সংযোজিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর সম্ভব। ইতিমধ্যে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজনীয় ইনসুলিন উৎপাদক জিন *E. coli* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডে স্থানান্তর করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইনসুলিন উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া একটি বৃদ্ধিকারী হরমোন (সোমাটোস্ট্যাটিন) এর জন্য দায়ী জিন *E. coli* তে স্থানান্তর করা হয়েছে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভিদে অনেক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। যেমন-

(ক) এ পদ্ধতির দ্বারা উৎপন্ন এক ধরনের তরকারী মার্কিন বাজারে ছাড়া হয়েছে, যার নাম ভেজিস্নাক্র সুইট মিনি পিপার বা মিষ্টি মরিচ।

(খ) ক্যালিফোর্নিয়ার প্রতিষ্ঠান ক্যালজিন ইলক জিন প্রযুক্তির সহায়তায় এক ধরনের টমেটো উদ্ভাবন করেছেন, যা সহজে পঁচে না, এ টমেটোর নাম রাখা হয়েছে ফ্লাভ স্যাভর টমেটো ।

রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির ধাপ : রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজির প্রধান ধাপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

(ক) প্রত্যাশিত DNA নির্বাচন ও পৃথকিকরণ : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম ধাপ হলো প্রত্যাশিত DNA অণু নির্বাচন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জীবকোষের মধ্যস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড ও অন্যান্য অংশ থেকে DNA অণুকে আলাদা করা হয়। DNA অণু আলাদা করতে সাধারণত সিজিয়াম ক্লোরাইড বা সুক্রোজ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ DNA অণু তৈরি করা হয়।

(খ) বাহক নির্বাচন : প্রত্যাশিত DNA অণুকে স্থাপনের জন্য একটি বাহকের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে *E. coli* বা *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিডকে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রত্যাশিত DNA অণুকে প্লাজমিড DNA তে সংযোজন করা হয়।

গ) প্রত্যাশিত DNA অণুকে ছেদন : এক্ষেত্রে প্রথমে প্রত্যাশিত DNA অণুকে মূল DNA থেকে কেটে আলাদা করা হয়। প্রত্যাশিত DNA অণুকে কাঁটতে একটি বিশেষ এনজাইম (রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা DNA ছেদন করা হয়) ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২৫০ টি রেস্ট্রিকশন এনজাইম আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- Eco RI, Hind III, Bam HI ইত্যাদি। রেস্ট্রিকশন এনজাইম DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান অংশকে (Sequence) কেঁটে দেয়। ভিন্ন ভিন্ন রেস্ট্রিকশন এনজাইম ভিন্ন ভিন্ন DNA sequence বিশিষ্ট স্থানে কর্তন করে থাকে। রেস্ট্রিকশন এনজাইম এমনভাবে DNA অণু কর্তন করে যে DNA অণু দুটি স্ট্রান্ডের একটির প্রান্ত অপরটির থেকে লম্বা থাকে। ফলে প্রত্যাশিত DNA খন্ডটি নতুন DNA অণুর সাথে সহজে যুক্ত হতে পারে। খন্ডিত DNA অণুর প্রান্তদ্বয় আঁঠালো প্রকৃতির হয়, তাই একে আঁঠালো প্রান্ত (Sticky end) বলে।

(ঘ) ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন : এক্ষেত্রে প্রথমে বাহক প্লাজমিডের DNA অণুকে একই প্রকার (যাহা দ্বারা প্রত্যাশিত DNA কর্তন করা হয়েছে) রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা ছেদন করা হয়। অতঃপর প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে প্রত্যাশিত DNA খন্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। প্লাজমিড DNA এর ফাঁকা অংশে

প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত করতে DNA লাইগেজ (DNA-ligase) এনজাইম সহায়তা করে। প্লাজমিড DNA এর সাথে প্রত্যাশিত DNA অণু সংযুক্ত হবার পর যে DNA তৈরি হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ (Recombinant DNA) বলে।

(ঙ) পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন : প্রত্যাশিত DNA অণুর বংশবৃদ্ধির জন্য রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA কে পোষক ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করানো হয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষ বিভাজনের সাথে সাথে উক্ত কোষে অবস্থিত রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড DNA (প্রত্যাশিত DNA অণু যুক্ত) অণুরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। ফলে প্রত্যাশিত DNA অণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ কোষে প্রবেশ করানো হয়। এরূপ উদ্ভিদকে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** বলে।

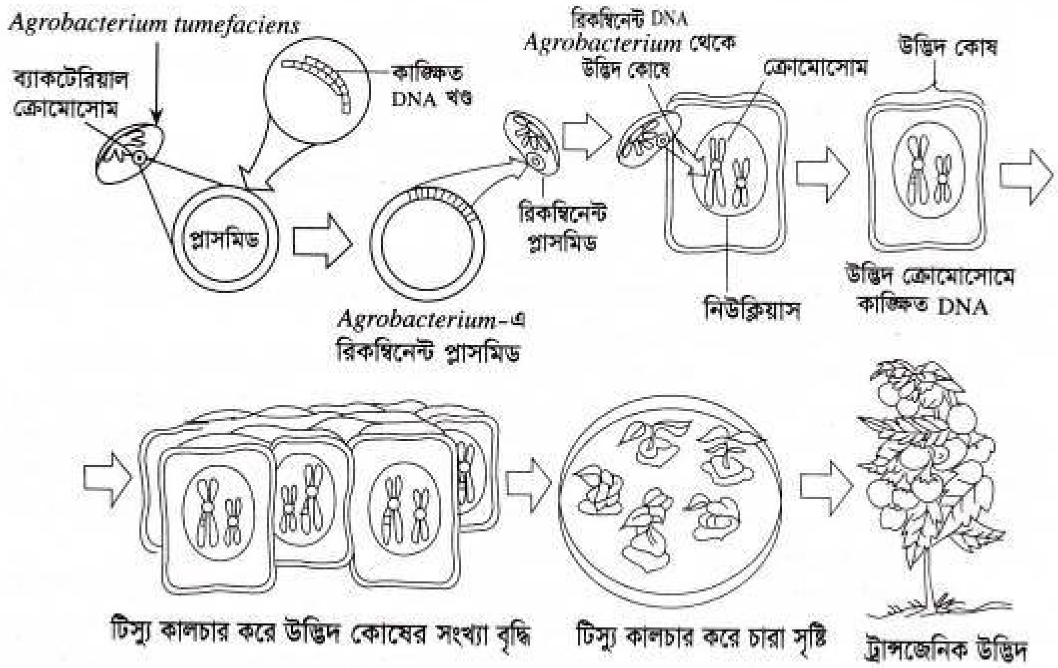

চিত্র ১৩.২ : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ধাপ

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধাপগুলো লিখুন			

সারসংক্ষেপ

বংশগতির যে শাখা জিনের পৃথকিকরণ, সংযোজন ও সংশ্লেষণ করে তাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (Recombinant DNA Technology) বলে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ধাপগুলো হলো- (ক) প্রত্যাশিত DNA নির্বাচন ও পৃথকিকরণ, (খ) বাহক নির্বাচন, গ) প্রত্যাশিত DNA অণুকে ছেদন, (ঘ) ছেদনকৃত প্রত্যাশিত DNA অণুকে বাহক প্লাজমিডে সংযোজন এবং (ঙ) পোষক নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষকে স্থাপন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। ডিএনএ কাটার জন্য বিশেষ এনজাইম কোনটি ?

(ক) লাইগেজ (খ) লেকটেজ (গ) লাইপেজ (ঘ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম

২। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে-

i. জিনের পরিবর্তন ঘটানো হয় ii. ডিএনএ এর পরিবর্তন ঘটানো হয়

iii. জীবের পরিবর্তন ঘটানো হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

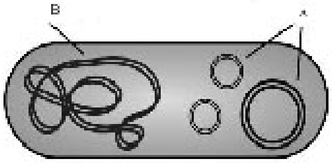

৩। চিত্রে উল্লিখিত A অংশটির নাম হলো-

i. প্লাস্টিড ii. প্লাজমিড iii. ব্যাকটেরিয়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii (ঘ) i, ii ও iii

৪। চিত্রে প্রদর্শিত জীবটির বৈশিষ্ট্য হলো-

i. এরা এককোষী ii. এরা অণুবীক্ষণিক iii. এদেরকে খালি চোখে দেখা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.৩ ইনসুলিন এবং Bt-বেগুন প্রস্তুতিতে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইনসুলিন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন বর্ণনা করতে পারবেন।
- জিএম খাদ্য ফসল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- Bt-বেগুন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- Bt-বেগুন চাষের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পোকানাশক স্প্রে এর ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করতে পারবেন।

	প্রধান শব্দ	জিএম খাদ্য, Bt-বেগুন

ইনসুলিন : ইনসুলিন একটি হরমোন। ইহা অগ্ন্যাশয়ের **Islets of langerhans** এর বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হয় যা রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজকে দেহ কোষে প্রবেশে সাহায্য করে। এর ফলে গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে। কোন কারণে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে বা কম নিঃসৃত হলে অথবা নিঃসৃত ইনসুলিন অকার্যকর হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ হয়। এ অবস্থায় ডায়াবেটিক রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। তাই ইনসুলিনের চাহিদাও ব্যাপক।

ইনসুলিন ৫১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (২১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-A এবং ৩০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-B) দুটি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে।

মানব ইনসুলিন উৎপাদন : ইনসুলিনের ব্যাপক চাহিদা মেটাতে গিয়ে এক সময় গরু বা শুকরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন সংগ্রহ করে তা মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হত। ইহা তেমন উপযোগী নয়। তাই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে মানুষের জিনকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন উৎপাদন সফলতার মুখ দেখে। মানুষের ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর ডিএনএ (DNA)-এর শীর্ষে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়।

চিত্র ১৩.৩ : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন

এতে ১৫৩টি নাইট্রোজেন-বেস নিয়ে গঠিত ইনসুলিনের জেনেটিক কোড রয়েছে। জিন প্রকৌশল তথা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকার Eli Lilly & Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয় 'হিউমুলিন' নামে।

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হলো-

১। একটি ব্যাকটেরিয়ামের প্লাসমিড নির্দিষ্টকরণ এবং মানুষের অগ্ন্যাশয় কোষ থেকে DNA পৃথকিকরণ।
২। মানুষের DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ পৃথক করা হয় এবং ঐ মাপে ব্যাকটেরিয়ামের প্লাসমিড অংশ রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাঁটা হয়।
৩। প্লাসমিডের কাঁটা অংশে ইনসুলিন জিন প্রবেশ করানোর পর লাইগেজ এনজাইম দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। ফলে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হয়।
৪। এবার একটি *E.coli* কোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশ করানো হলে *E.coli* টি GM *E.coli* এ পরিণত হয়।
৫। একটি উপযুক্ত পাত্রে (ফার্মেন্টেশন ট্যাংক যাতে উপযুক্ত তাপমাত্রা বিদ্যমান) GM *E.coli* প্রবেশ করিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংখ্যাবৃদ্ধি করা হলো।
৬। ফার্মেন্টেশন ট্যাংক থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী *E.coli* থেকে ইনসুলিন সংগ্রহ করা হয় এবং তা উপযুক্ত এম্পলে বাজারজাত করা হয়।

বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ইনসুলিন ডেনমার্কের ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক জীন প্রকৌশল প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ও বাজারজাতকৃত।

জিএম খাদ্য ফসল : বর্তমানে জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনে উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে এখন ৩০টি দেশ GM ফসল উৎপাদন করছে। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৪, বাংলাদেশে প্রথম একটি GM খাদ্য ফসল (Bt-বেগুন) চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি জাত নির্বাচিত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

Bt-বেগুন : *Bacillus thuringiensis* নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন (Cry1Ac) বেগুনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেগুনের নাম দেয়া হয়েছে Bt-বেগুন। সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য হলো এক প্রকার পোকা সাধারণ বেগুন গাছের কচি ডগা ও ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে ফেলে যার ফলে ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়। পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কৃষককে প্রতি সিজনে ৬০-১৮০ বার পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। Bt-বেগুনে ঐ পোকার আক্রমণ হবে না, তাই পোকানাশক ওষুধও স্প্রে করতে হবে না।

Bt-বেগুন চাষের গুরুত্ব : Bt-বেগুন চাষ করলে কৃষক নিম্নলিখিতভাবে লাভবান হবেন-

১। পোকানাশক ওষুধ কিনতে হবে না এবং স্প্রে করতে হবে না। এতে লক্ষ লক্ষ টাকা উৎপাদন খরচ কম হবে।
২। যারা বেগুন খান তারাও ঐ বিষ দ্বারা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবেন না এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে বেঁচে যাবেন।
৩। মাটি ও পরিবেশ বিষমুক্ত থাকবে।
৪। আশেপাশের জলাশয় বিষমুক্ত থাকবে এবং জলজ পরিবেশের স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।
৫। উৎপাদন বাড়বে।

পোকানাশক স্প্রে এর ক্ষতিকর দিক

১। বেগুনের সাথে ওষুধ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং এর ফলে ক্যান্সারের ন্যায় মারাত্মক রোগ হতে পারে।
২। ফসলের জমি থেকে বৃষ্টির পানির সাথে পোকানাশক বিষ নিকটস্থ নদী নালা খাল বিলে জমা হয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশেষ করে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।
৩। মাটি ও পরিবেশ বিষাক্ত হয়।
৪। কৃষককে লক্ষ লক্ষ টাকার ওষুধ কিনতে হয় এবং বহু সময় ব্যয় হয়।
৫। ওষুধ স্প্রেকারী ব্যক্তিও এক সময় এ বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এতে কেবলমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাভবান হয়। অন্য সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিচের ছকে Bt-বেগুন ও সাধারণ বেগুনের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন
Bt-বেগুন	সাধারণ বেগুন

সারসংক্ষেপ

ইনসুলিন একটি হরমোন। ইহা অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হয় যা রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রাকে হ্রাস করে ফলে রক্ত স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে। কোন কারণে অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে বা কম নিঃসৃত হলে অথবা নিঃসৃত ইনসুলিন অকার্যকর হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায় অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ হয়। ইনসুলিন ৫১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (২১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-A এবং ৩০টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-B) দুটি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে। বর্তমানে জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উৎপাদনে উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবী জুড়ে এখন ৩০টি দেশ GM ফসল উৎপাদন করছে। *Bacillus thuringiensis* নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন (Cry1Ac) বেগুনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেগুনের নাম দেয়া হয়েছে Bt-বেগুন। সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য হলো এক প্রকার পোকা সাধারণ বেগুন গাছের কচি ডগা ও ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে ফেলে যার ফলে ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়। পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কৃষককে প্রতি সিজন এ ৬০-১৮০ বার পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। Bt-বেগুনে ঐ পোকার আক্রমণ হবে না, তাই পোকানাশক ওষুধও স্প্রে করতে হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কতটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে ইনসুলিন গঠিত ?

(ক) ৫১টি (খ) ৫২টি (গ) ৫৩টি (ঘ) ৫৪টি

২। মানুষের ইনসুলিন হরমোন-

i. অগ্ন্যাশয় হতে নিঃসৃত হয়

ii. রক্তে গ-ুকোজের মাত্রা হ্রাস করে

iii. গ-ুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii, ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন- ১

করিম ও বাবুল তাদের গ্রামের মাঠে পাশাপাশি ধান চাষ করেছেন। করিমের ক্ষেতে বাবুলের ক্ষেতের তুলনায় ধানের ফলন বেশি হয়েছে। বাবুলের ক্ষেতে পোকার আক্রমণ হলেও করিমের ক্ষেতে পোকার আক্রমণ হয়নি। এর কারণ করিমের ধানক্ষেতে ব্যবহৃত বীজ এক বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি।

(ক) ক্লোন কী ?

(খ) জিএম খাদ্য ফসল সম্পর্কে লিখুন।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত করিমের ব্যবহৃত ধানের বীজ তৈরির পদক্ষেপগুলো চিত্রের মাধ্যমে দেখান।

(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১ : ১। ঘ ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। গ ৪। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৩ : ১। ক ২। ক